মহাত্মা গান্ধীর কাহিনী

এস. ডি. সাওয়ন্ত • এস. ডি. বাদলকর

মহাত্মা গান্ধীর কাহিনী

এস. ডি. সাওয়ন্ত ● এস. ডি. বাদলকর

পাবলিকেশন্‌স্ ডিভিশন

First Edition : August 1966 (Shravana 1888)
Second Edition : December 1970 (Pausa 1892)
Third Edition : July 1981 (Sharavana 1904)

Price Rs. 10.00

GANDHI STORY (Bengali)

Published by the Director, Publications Division,
Ministry of Information and Broadcasting, Government of India
Patiala House, New Delhi - 110001

Sales Emporia • Publications Division

Super Bazar, 2nd Floor, Connaught Circus, New Delhi - 110001
Commerce House, Currimbhoy Road, Bailard Pier, Bombay - 400038
8 Esplanade East, Calcutta - 700069
L. L. A. Auditorium, 736 Anna Salai, Madras 600002
Bihar State Co - Operative Bank Building, Ashoka Rajpath, Patna-800004
Press Road, Trivandrum - 695001
10 B Station Road, Lucknow - 226004

Printed at Shivraj Fine Art Litho Works, (D. C. V. L.)
Subhash Road, Nagpur – 440018.

ভূমিকা

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের এই চিত্রায়িত কাহিনী নিশ্চয়ই আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খুবই ভালো লাগবে। গান্ধীজীর জীবনকাহিনী সেই বিগত যুগ থেকে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্যের এক অপরিহার্য অংগ হয়ে রয়েছে, আজো সেই মহৎ জীবনকাহিনী আমাদের বর্তমানকে গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি অনাগত কালের যাঁরা, তাঁরাও এই জীবনকাহিনী পাঠ ক'রে চমৎকৃত হবেন, বিস্মিত হবেন। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গান্ধীজীর জীবন সম্পর্কে আরো অন্যান্য বই পড়বার আগে যদি তারা চিত্রের মাধ্যমে বর্ণিত এই কাহিনীর সংগে পরিচিত হয় তা'তে খুবই ভালো হবে।

জওহরলাল নেহরু

নতুন দিল্লী
৩০শে জুন, ১৯৬২

মহাত্মা গান্ধীর জীবনকথা

পিতামহ উত্তমচাঁদ ও তাঁর মৃত্যুর পর গান্ধীজীর পিতা করমচাঁদ ছিলেন পোরবন্দর নামে ছোট এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান।

মহাত্মা গান্ধীর পিতা করমচাঁদ ছিলেন একজন নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ মানুষ।

এই বাড়িতে ১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর তারিখে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জন্ম হয়।

আচারনিষ্ঠ মা পুতলীবাই পুজো-অর্চনা না করে আহার করতেন না।

চতুর্মাস ব্রতের সময় সূর্যের মুখ না দেখা পর্যন্ত তিনি উপবাসী থাকতেন।

মোহনদাসের ইচ্ছা সে যেন অন্যদের মতো শক্তিমান ও সাহসী হয়। ওদের বাড়িতে পুরোপুরি নিরামিষের ব্যবস্থা।
আমার গায়ে এত জোর কেন জান? মাংস খাই বলে।
বন্ধু ঠিক বলেছে। সাহেবরা নিরামিষ-ভোজী ভারতীয়দের উপর প্রভুত্ব করছে।

একদিন মোহনদাস মাংস খেল।
এবার তাহলে আমারও গায়ে জোর, মনে সাহস হবে।
নিশ্চয়!

মনে তার সংশয় এল।
আমিষ খাওয়া আমার ধর্মে বারণ। মাংস খেয়েছি সে কথা লুকোতে গিয়ে আবার আমায় মিথ্যা বলতে হচ্ছে।

তার ভায়ের হ'ল দেনা।
তোমার এই হাতের বালা পাকা সোনায় তৈরী। এটা থেকে এক টুকরো আমি কেটে দেব?
ঠিক বলেছো মোহন, তাহলে, আমার ধারটা শোধ হয়।
ধার তো এইভাবে শোধ হ'ল।

কিন্তু এরকম মিথ্যাচরণ মোহনের অসহ্য মনে হ'ল। সব কথা কবুল করে সে একটা চিঠি লিখে তার বাবার হাতে দিল। বাবা তখন রোগে শয্যাশায়ী।
পীড়িত পিতার চোখের জলে মোহনের মনের গ্লানি যেন ধুয়ে গেল।

মোহনদাস মা বাবাকে খুব ভক্তি করত। বাবার অসুখের সময় দিনরাত তাঁর সেবাশুশ্রূষা করত। বাবা যখন গত হলেন তখনো তার ষোলো বছর বয়সও হয় নি।

মোহনদাস তেরোয় পা দিলে কস্তুরবার সঙ্গে বিয়ে হল।

স্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেলে পর মোহনদাসকে গান্ধী পরিবারের একজন বন্ধু বললেন,

খুড়ো বললেন, মোহনের মা যেমন বলবেন তাই হবে দাদা কথা দিলেন টাকা তিনিই যোগাড় করবেন।

শেষকালে এক জৈন সাধু উপায় খুঁজে বের করলেন। তিনি বললেন মোহনদাসকে শপথ করতে হবে।

বিলেত গিয়ে মোহনদাস লন্ডনের নিরামিষ-ভোজী সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন ও উচ্চ আদর্শবাদী বহু বন্ধু লাভ করলেন।

লন্ডনে থাকার সময় প্রথম গীতা পড়লেন। গীতা তাঁর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে তিনি সাদা-সিধে জীবন যাপন করতে লাগলেন। যথা সময়ে দেশে ফিরলেন ব্যারিস্টার হয়ে। দাদা এসেছেন জাহাজ থেকে নামিয়ে নিতে। দাদার কাছে নিদারুণ দুঃসংবাদ শুনলেন।

ভারতে গান্ধীজীর পসার জমল না। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থিত ভারতীয় এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাঁকে উকীল নিযুক্ত করে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠান। কস্তুরবা ও তাঁর দুই ছেলে দেশে রয়ে গেলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জাহাজ থেকে নেমে তাঁকে রেলযোগে প্রিটো-রিয়া শহর যেতে হবে। চলতি পথে এক স্টেশনে—
কালা আদমির সঙ্গে এক কামরায় বসে আমি যেতে পারবো না।
MARITZBURG

তোমাকে থার্ড ক্লাসে যেতে হবে. অফিসার, এই লোকটাকে নামিয়ে দিন।
কিন্তু আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে।

একজন পুলিশ কনস্টেবল তাঁকে জোর করে নামিয়ে দিল।
এ দেশ ছেড়ে কি চলে যাবো?...... নাঃ সে হবে নিদারুণ কাপুরুষতা।
WAITING ROOM

দূরে যাত্রী এক গাড়ীতে গান্ধীজীকে বলা হ'ল কোচ-ম্যানের পাশে বসতে। একজন শ্বেতাঙ্গ আসায় হুকুম হলো কোচম্যানের পায়ের তলায় বসতে।
না। টিকেটের জোরে আমার আসন ভিতরে।
তবে রে! কালা ব্যাটা! কুলি কোথাকার!
ওকে মারধোর ক'রো না। ও ঠিক বলেছে।
দক্ষিণ আফ্রিকায় স্বদেশীয়দের দুরবস্থায় গান্ধীজী খুব ব্যথা পেলেন।

প্রিটোরিয়ায় যত ভারতীয় ছিল তাদের ডেকে গান্ধীজী একটি সভা করলেন।

একাধিক সভা হল

এই গান্ধী লোকটা কিন্তু আশ্চর্য মানুষ।

মনে মুখে এক। এই গান্ধীই হয়তো একদিন আমাদের মানুষ করে তুলবে।
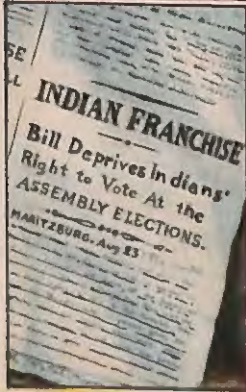
গান্ধীজি দেশে ফিরলেন পরিবারবর্গকে নিয়ে যেতে, বড়ো বড়ো জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। গোখ্‌লে প্রভৃতি নেতারা তাঁকে সমর্থন করলেন।
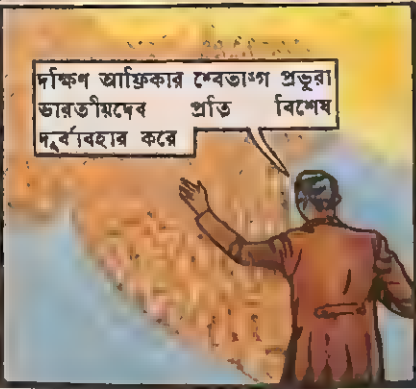
তিনি ফিরে গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানকার শ্বেতাঙ্গ সমাজ তাঁর প্রতি তখন বেশ রুষ্ট।

শেষকালে পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট-এর স্ত্রী গিয়ে ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে গান্ধীজীকে উদ্ধার করে আনলেন।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ তাঁকে রুস্তমজীর বাড়িতে পৌঁছে দেয়। এখানে জনতা এসে জমায়েত হল। বাড়ি ঘেরাও করে শাসাল, গান্ধীকে তাদের হাতে তুলে না দিলে তারা ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেবে।

পুলিশ সুপারের বুদ্ধিতে সে যাত্রা রক্ষা পেলেন।
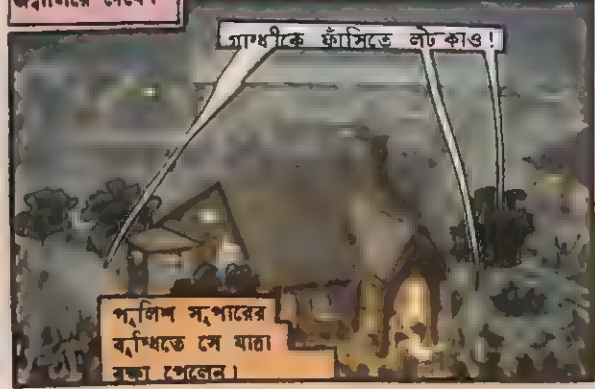
১৮৯০ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজদের সঙ্গে ইংরেজদের বুওর যুদ্ধ হয়, এই সময় গান্ধীজী ভারতীয়দের একটি এম্বুলেন্স বাহিনী গঠন করেন, বৃটিশ সরকারকে সাহায্য করার জন্য।
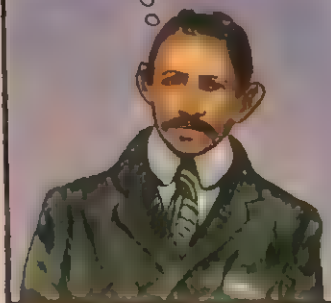
আমি তো জনসেবক। এসব বহুমূল্য উপহার নিজের কাছে রাখা উচিত নয়। যাই, আগে এ সব কথা বাড়ির লোককে বুঝিয়ে বলি।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। ডারবানের কাছাকাছি ফিনিক্স নামে একটি গাঁয়ে জমি কিনে সহকর্মীদের নিয়ে চাষবাস শুরু করে দিলেন। সকলে মিলে কায়িক শ্রম, নিয়মানুবর্তিতা ও কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে সহজ সরল দারিদ্র্য বরণ করে নিলেন।

ট্রান্সভাল সরকারের একটি অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সমস্ত ভারতীয়কে সরকারী দপ্তরে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। সরকারের দেওয়া অনুমতি পত্র সর্বক্ষণ সংগে সংগে রাখতে হবে।

এই অর্ডিন্যান্স বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া চলবে না। একে স্বীকার করে নেওয়া মানে লাঞ্ছনা স্বীকার করা।
ঠিক ঠিক!

আমি প্রস্তাব পড়ে দিলাম। বন্ধুগণ, এবার ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে আপনারা এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিন।

ড়ান আপনাদের সাবধান করে দি। ব বিচার না করে কথা দেবেন না। কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারলে ভগবানের কাছে যেমন মানুষের কাছেও তেমনি দোষ।
আমরা প্রাণ দেব তবু এই অন্যায় আইনের কাছে মাথা নোয়াবো না।
এইভাবে সত্যাগ্রহের জন্ম হল।

গান্ধীজী ও তাঁর কয়েকজন সংগী আইনভংগের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

জেলখানা থেকে তাঁকে আনা হল জেনারেল স্মাটস-এর সংগে সাক্ষাতের জন্য।
শ্বেতাঙ্গদের দাবী অনুযায়ী আমাকে এই আইন বলবৎ করতে হচ্ছে। যদি ভারতীয়েরা স্বেচ্ছায় নাম রেজিস্ট্রি করে, তা হলে যাকে 'কালা' আইন বলছেন, তা তুলে নেবো।
বেশ এই প্রস্তাব মেনে নিলাম।

গান্ধীজী জোহানেসবার্গ শহরে এসে ভারতীয়দের এক সভায় এই কথা বললেন।

আমরা স্বেচ্ছায় রেজিস্ট্রি করব
সবুর করুন একটু, আপনিই না মানা করেছিলেন আমাদের টিপ সই দিতে?

মানা করেছিলাম। এখন অবস্থা অন্য রকম। সরকার জুলুম করছে না আমাদের নাম রেজিস্ট্রি করতে।
আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করতে এসেছেন! আল্লার নামে শপথ, যে লোক নাম রেজিস্ট্রি করতে এগোবে তাকে আমি খুন করবো।

ভায়ের হাতে যদি আমার প্রাণ দিতে হয়, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।

গান্ধীজী তাঁর দল বল নিয়ে গেলেন নাম রেজিস্ট্রি করতে।
এখানে কি করতে এসেছেন?
টিপসই দিয়ে আমি নাম রেজিস্ট্রির সার্টিফিকেট নিতে এসেছি।

পাঠানদের দলপতি মীর আলম গান্ধীজীকে আক্রমণ করল।
কিছু শ্বেতাঙ্গ এসে পাঠানদের ধরপাকড় করে পুলিশের হাতে দিল।

জ্ঞান যখন ফিরে এল গান্ধীজী একজন সরকারী কর্মচারীকে ডেকে নিজের নাম রেজিস্ট্রি করালেন।
না, না। ওরা জানে না ওরা কি করেছে।
ঐ পাঠানদের আদালতে অভিযুক্ত করা উচিত।

ওরা 'কালা' আইন আগেভাগে তুলে নিল না কেন? এখন যদি জেনারেল স্মাটস্ তাঁর কথা না রাখেন?

যে লোক সত্যের পথ বেছে নিয়েছে, তাকে ভয় থেকে মুক্ত হতে হবে। সত্যের পরাজয় নেই। জেনারেল স্মাটস্ যদি তাঁর কথা ফেরান, তাহলে তাঁর মুখোস খসে পড়বে।

পারমিটগুলো পোড়ানো হল।
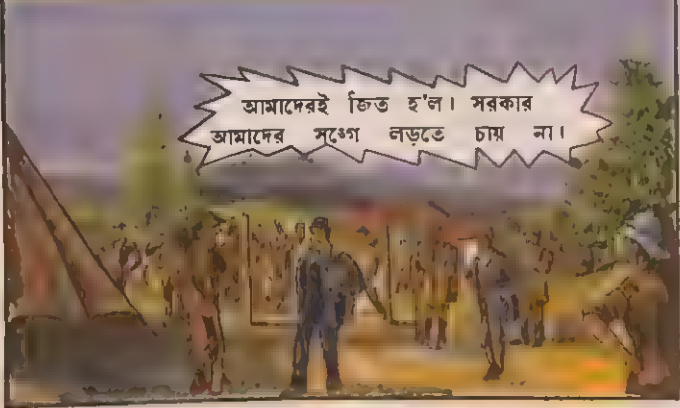
দক্ষিণ আফ্রিকার এক আদালতের রায় হল যে খৃস্টান মতে যে বিয়ে হয় নি, সে বিয়ে আইনে অসিদ্ধ।

এর মানে এই যে আইনের চোখে আমরা কেউ বিবাহিত স্ত্রী নই?

প্রতিবাদে ভারতীয় খনি মজুরেরা ধর্মঘট করল। পাঁচ হাজার ধর্মঘটকারী চলে এল গান্ধীজীর কাছে।

আমরা নাটাল ট্রান্সভালের সীমা লঙ্ঘন করে চলে যাব আমাদের টলস্টয় ফার্ম-এ বসবাস করতে। পুলিশ যদি ধরপাকড় করতে আসে তাদের বাধা দেওয়া হবে না।

সীমান্তরক্ষী পুলিশ এদের বাধা দিল না। ট্রান্সভালে পদযাত্রার প্রথম দিনের এক দফা যাত্রা যখন শেষ হল গান্ধীজী সবে বিশ্রাম নেবার উদ্যোগ করছেন

একাধিক বার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হলো। তারপর পঞ্চাশ হাজার ভারতীয় গান্ধীজীর এই আন্দোলনে যোগদান করলো।
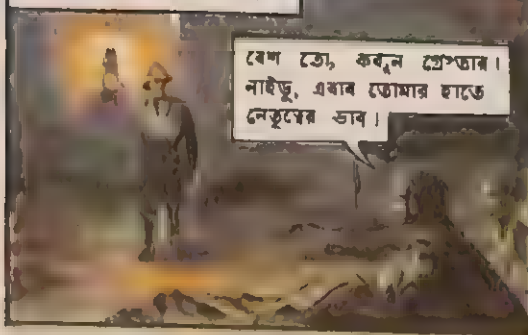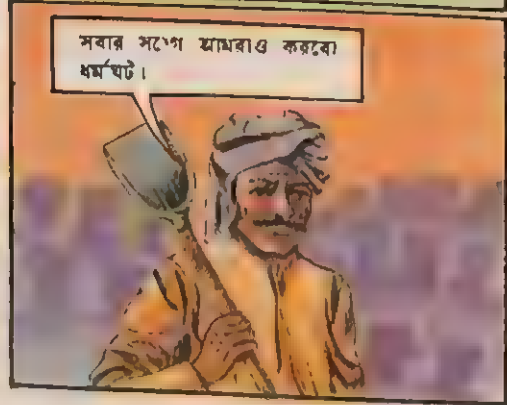
জেল থেকে খালাস পেয়ে ঘরে ফিরে গান্ধীজী এবার বিশুদ্ধ মিশ্রী ধরনের ভারতীয় পোশাক ধরলেন।
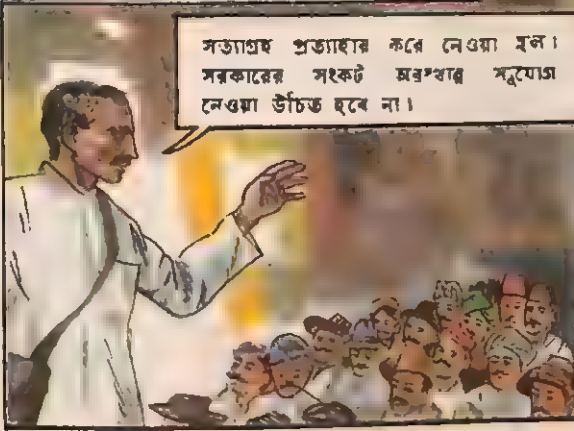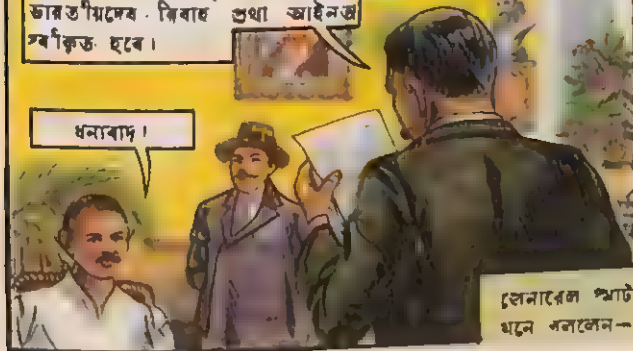
১৯০৬ সালে যে সংগ্রামের শুরু, তা জয়যুক্ত হল। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর প্রারব্ধ কাজ শেষ হল। এবারে তিনি দেশে ফিরলেন। বম্বেতে জাহাজ এসে লাগল ১৯১৫ সালের জানুয়ারীতে।
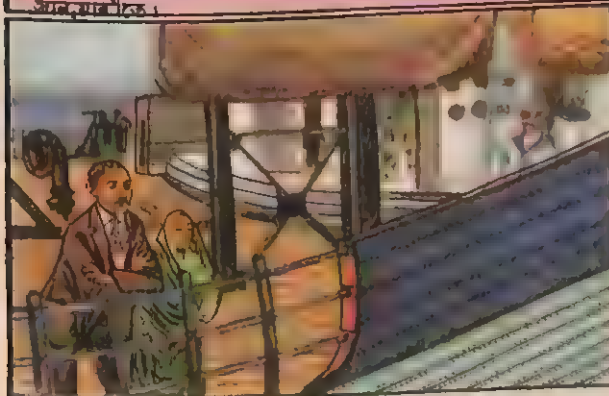
গান্ধীজী নিজের হাতে তৈরি এক জোড়া চটি জুতো স্মাটস্‌কে উপহারস্বরূপ দিয়েছিলেন। স্মাটস্ পরে বলেছিলেন—

'আমি এই জুতোজোড়া পরেছি বহুবার। প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে ওরকম এক মহান লোকের জুতো পরার যোগ্য আমি নই।'

ভারতের বড়লাটের যেমন সম্বর্ধনা হত গেট্‌ওয়ে অব্‌ ইন্ডিয়া তোরণের নিচে, গান্ধীজীরও অনুরূপ সম্বর্ধনা হল।

দেশে ফিরেই তিনি গোখলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

গেলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সম্বর্ধনা জানালেন।

সেখানকার রান্নাঘরে তিনি আত্মনির্ভরতা পরীক্ষা চালালেন।

মাদ্রাজে কস্তুরবা ও গান্ধীজীর সম্মানে সম্বর্ধনা সভা হয়। তাতে তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তৃতাদি হয়।

এই যশের মুকুট আমায় সাজে না—এই সম্মান তাদের প্রাপ্য যারা দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছে।

আমেদাবাদ শহরের উপকণ্ঠে কোচরাব পল্লীতে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করলেন। আশ্রমবাসীদের ডেকে বললেন

যদি দেশের লোকের সেবা করতে চান, তাহলে ব্রত গ্রহণ করতে হবে। সত্য, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, চুরি করা চলবে না, কোন বস্তুর স্বত্ব লাভ করা চলবে না আর রসনা সংযত করতে হবে।

পণ্ডিত মালব্য বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করলেন।
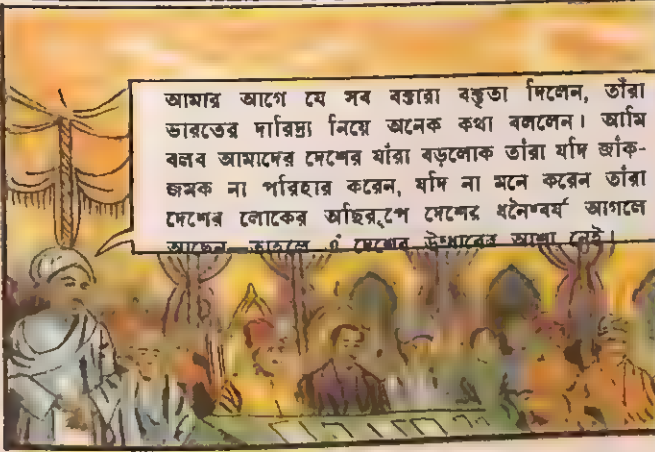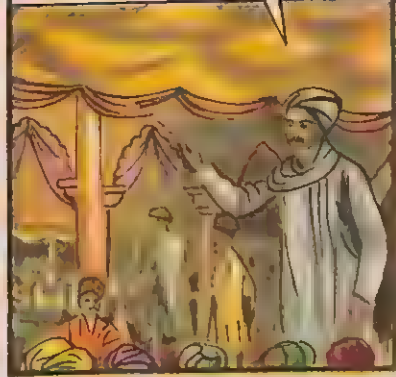
এরপর গান্ধীজী ফিরে গেলেন কোচরাব। আশ্রমে তিনি এক হরিজন পরিবারকে আশ্রয় দিলেন। এ নিয়ে হুলুস্থুল কাণ্ড।
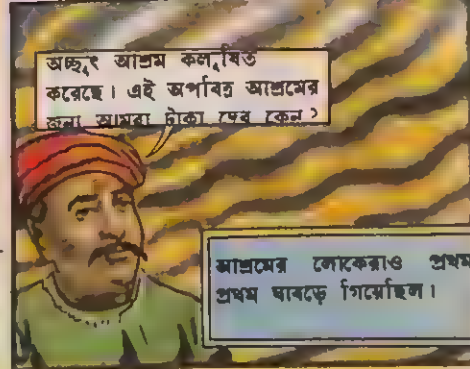
আশ্রমের লোকেরাও প্রথম প্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পরদিন অজ্ঞাতনামা কোনো সহৃদয় মানুষ গান্ধীজীর হাতে আশ্রম চালাবার খরচ বাবদ তেরো হাজার টাকা তুলে দেন।

গান্ধীজীর কাজ চলতে থাকলো।

১৯১৬ সালে গান্ধীজী গেছেন লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে। একজন কৃষাণ তাঁর পিছনে লেগে রইল কিছুতেই সংগ ছাড়ে না।

চম্পারণে গরীব চাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের অন্ত ছিল না। সাহেবদের হুকুমে তাদের জমির শতকরা পনেরো ভাগে নীলের চাষ করতে হত ও উৎপন্ন নীল সাহেবদের হাতে তুলে দিতে হত। জার্মানিতে যখন কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হল তখন নীলকরেরা চাষীদের এই পুরাতন প্রথা থেকে অব্যাহতি দেবার পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগল। চাষীরা বুঝল এই জবরদস্তি অন্যায়। তারা তাদের টাকা ফেরত চাইল

গান্ধীজী চম্পারণের কমিশনারের কাছে গেলেন সুবিচার পাবার আশায়।

কমিশনারের কথা অমান্য করার অপরাধে গান্ধীজীকে আদালতে হাজির হতে হল।

কিন্তু সরকারের সুবুদ্ধির উদয় হ'ল, তাঁরা মামলা তুলে নিলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাবে সরকার এক তদারকী কমিশন নিযুক্ত করলেন। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রচুর সাক্ষ্য জমা হ'ল। শেষ পর্যন্ত চাষীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া টাকা তাদের ফেরত দিতে হ'ল।
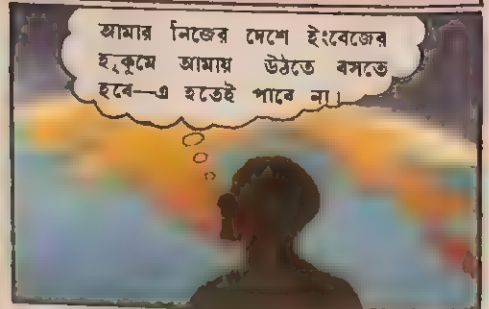
গান্ধীজী গেলেন আমেদাবাদে। সেখানে মিল মালিকদের কাছে গেলেন মজুরদের দুরবস্থার
মজুরেরা মাইনে বৃদ্ধির দাবী করছে, আপনারা সে দাবী মানতে চান না। সালিসী মেনে
না, তা হয় না।

তাহলে ধর্মঘট ছাড়া গতি নেই।
ঠিক বলেছেন, বাপু।

সত্য আপনাদের পক্ষে। হাল ছেড়ে দেবেন না, শান্তি রক্ষা করে চলবেন। সত্যের জয় হবেই।
কিছু ধর্মঘটীদের মনে সংশয় এল।
আপনাদের এই দুরবস্থায় আমি কষ্ট পাচ্ছি। সালিসীতে বিবাদের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আমি অনশনে থাকবো।

গান্ধীজীর সঙ্গীরা ভয় পেল, কিন্তু তাঁর

শুরু হল উপবাস তিন দিন পরে...
আমাদের মার্জনা করে অনশন ত্যাগ করুন। আমরা আপনার কথা মতো সালিসী মেনে নিতে রাজী।
শেষে একটা রফা হ'ল।

সবরমতী আশ্রমের জীবন ছিল সহজ সরল ও নিয়মানুগ।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম ...

আশ্রমের উদ্দেশ্য সংগঠনী কাজের কর্মী তৈরি।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কস্তুরবা একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন।
এক ঘণ্টার মধ্যে চারজন অতিথি আসবেন। তাঁদের জন্য কিছু রান্না করো, কিন্তু বা'র ঘুমে যেন ব্যাঘাত না হয়।

হঠাৎ হাত থেকে পড়লো একটা বাসন। কস্তুরবার ঘুম গেল ভেঙে।
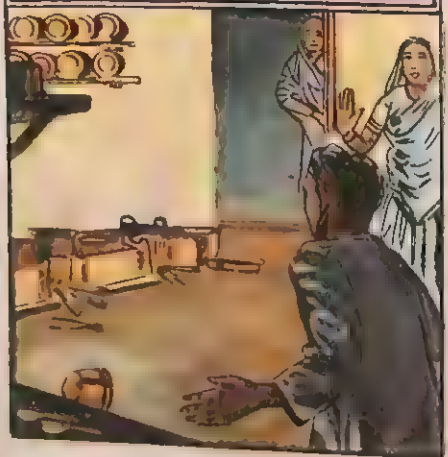
পরে
আমায় জাগালে না কেন? আমি তো বেশ রেঁধে বেড়ে দিতে পারতাম।
বা, তোমার কাঁচা ঘুমে ব্যাঘাত করতে আমার ভয় হল।
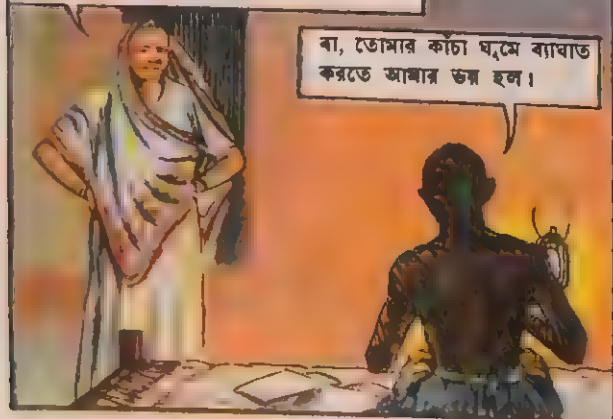
তুমি আমায় ভয় করো!

যুদ্ধের পর মানুষের মন তিক্ত। পরাধীনতা সহ্য হয় না।
যুদ্ধ তো শেষ হল। আশা ছিল কিছু নাগরিক স্বাধীনতা পাব। কিন্তু স্যার সিডনি রাওলাট সুপারিশ করেছেন আরো কিছুদিন যুদ্ধকালীন কড়াকড়ি থাকবে। নিপাত হোক রাওলাট।
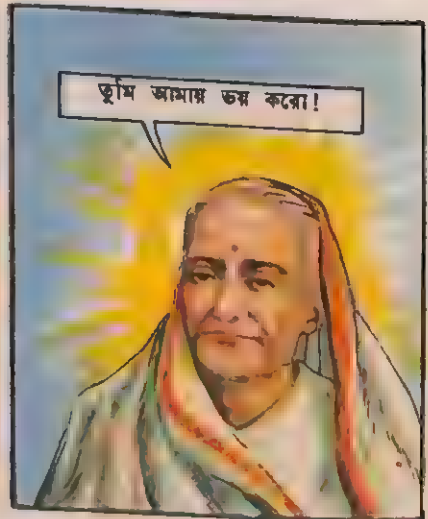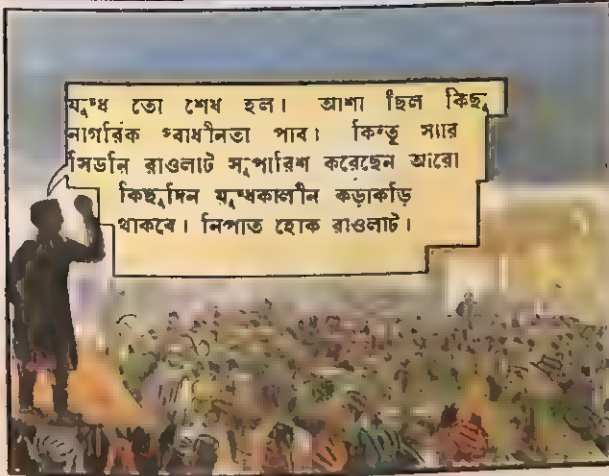
হরতাল পালনের জন্য সারা দেশকে আহ্বান জানাতে হবে।

দেশব্যাপী হরতাল সফলভাবে পালিত হল।

উত্তেজিত লোক হিংসাত্মক কাজ করলো
আমি শুনেছি কয়েক জায়গায় পাথর ছোঁড়া হয়েছে। এ রকম করলে চলবে না, একে সত্যাগ্রহ বলে না।

তবু কয়েক জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে লাগলো।
আমার ভুল হয়েছে। আমার বোঝা উচিত ছিল এই রকম আন্দোলন সফল করতে হলে আগে লোকদের শিক্ষা দিতে হবে কি করে শান্তিপূর্ণভাবে আইন অমান্য করা যায়। হরতাল তুলে নিতে হবে।

অপরকে শারীরিক আঘাত না করাই অহিংসা নয়। সকলকে ভালবাসাই অহিংসা। আমি শত্রুকে ভালবাসি কিন্তু অমঙ্গলের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রাম।

অমৃতসরে দু'দিন শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হল। কিন্তু সরকার দু'জন জনপ্রিয় নেতাকে অমৃতসর থেকে বহিষ্কার করলেন। এই অবিচারে শহরের লোক চঞ্চল হয়ে উঠল।
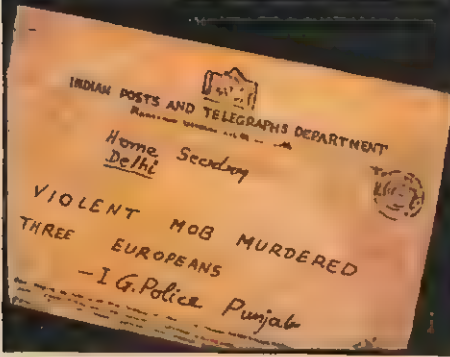
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারকে পাঠানো হ'ল পুলিশকে সহায়তা করার জন্য। তিনি হুকুম দিলেন—

কিন্তু ডায়ার-এর হুকুম শহরের সর্বত্র প্রচারিত হয় নি।

চারদিকে ঘরবাড়ি, মাঝখানে বাগ। সেখানে দশ থেকে বিশ হাজার মতন লোক জমায়েত হয়েছে। বাগের মধ্যে মাত্র দু'টি সংকীর্ণ প্রবেশ পথ। জনগণকে সতর্ক না করেই ডায়ার হাঁকল :

১৬৫০ বার গুলি ছোঁড়া হল। ৩৭৯ জন লোক মারা গেল, আহত হ'ল ১১৩৭ জন।

পরে তদন্ত কমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে ডায়ার স্পষ্ট বলেছিলেন :—

ডায়ারের এই নির্মম হত্যাকাণ্ডে ভারতের মন বিষিয়ে যায়, গান্ধীজী গভীর বেদনা পান।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় হয়েছিল। তুর্কিদের সুলতান ছিলেন মুসলমান জগতের ধর্মগুরু। মুসলমান সম্মেলন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে গান্ধীজী গেলেন দিল্লী।
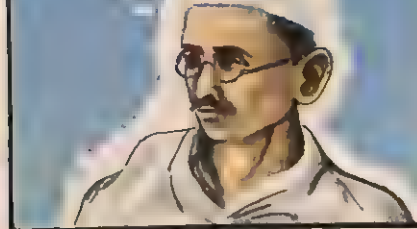
লোকমান্য তিলকের মৃত্যু হল। গান্ধীজী তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। তিলকের মৃত্যুতে তিনিই হলেন ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা। গান্ধীজী কংগ্রেসের নিয়মতন্ত্র পাল্টে দিলেন যাতে দলে দলে দেশের লোক কংগ্রেসে যোগ দেয়।
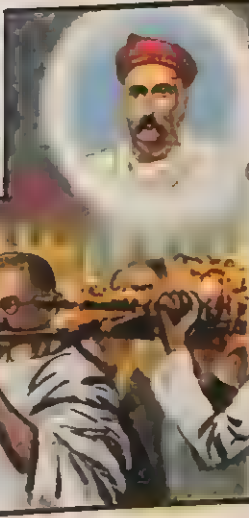
দেশময় তিনি ঘুরে বেড়ালেন, বহু জনসভায় বক্তৃতা দিলেন। তাঁর আহ্বানে প্রতিষ্ঠাবান আইনজীবীরা তাঁদের জীবিকা ছেড়ে দেশের কাজে নামলেন।
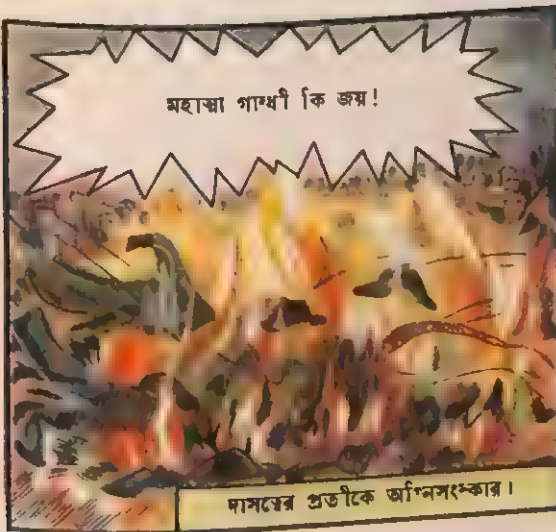
দাসত্বের প্রতীকে অগ্নিসংস্কার।

বিদেশী বস্ত্রের বদলে মহাত্মা গান্ধী আনলেন হাতে কাটা সুতো দিয়ে তৈরি খাদি। পরলেন হাঁটুর উপর তোলা আট হাতি কাপড়। জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দিলেন, নূতন নূতন দিকে দেশের জনশক্তিকে চালনা করলেন। সরকার হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হাজতে পুরলেন।

এ্যাপেন্ডিসাইটিস-এর জন্য অস্ত্রোপচারের পর গান্ধীজীকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিশ্রামের জন্য জুহুর সমুদ্রতীরে কিছুকাল কাটালেন।

হিন্দুরা ধর্মের শোভাযাত্রা করে বেরুত মসজিদের সামনে। মুসলমানেরা যখন নমাজ পড়ে, সেই সময়ে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে তাদের বিরক্তির কারণ ঘটায়।

মুসলমানরা গোরু কেটে হিন্দুদের ধর্মভাবে আঘাত হানে।

বহু স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ল।

না, এ রকমটা চলতে পারে না। এতে কেবল ধর্মের লাঞ্ছনা নয়, মনুষ্যত্বেরও। এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হ'ল হিন্দু মুসলমানের ঐক্য। তা না হলে দেশ স্বাধীন হবে না।

মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজেন্দ্র প্রসাদের মতো বড় বড় নেতারা সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পেলেন না।

গান্ধীজী ২১ দিনের জন্য অনশন করলেন—তাতে ফল হল না।

রাজদ্রোহাত্মক লেখা লিখেছেন বলে অভিযোগ এসেছে।

দোষ স্বীকার করছি। আইনের চোখে যা অন্যায়, অথচ যা নাগরিকরূপে আমার কর্তব্য মনে করি, তার জন্য চরম দণ্ড নিতে প্রস্তুত

জজ ব্রুমাফিল্ডকে কর্তব্য করতে হল। গান্ধীজী দোষী রায় দিলেন।

হিন্দু মুসলমানের একতা দেশময় প্রচার করতে বেরুলেন। সবাইকে বললেন অস্পৃশ্যতা পরিহার করতে ও দেশের কাজের জন্য অর্থ দিতে।

বড়লাটের কাছ থেকে দিল্লীতে আসার জন্য আমন্ত্রণ পেলেন।
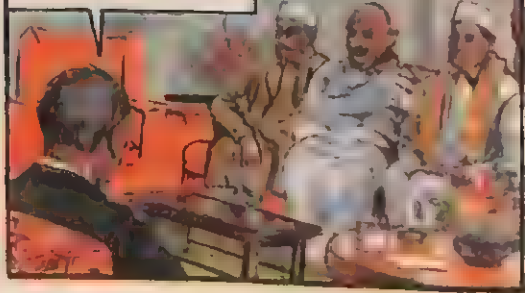
এ কেমন হ'ল? এই কমিশনে একটিও ভারতীয় সদস্য নেই। এ অর্থহীন। আমরা এই কমিশন বয়কট করবো
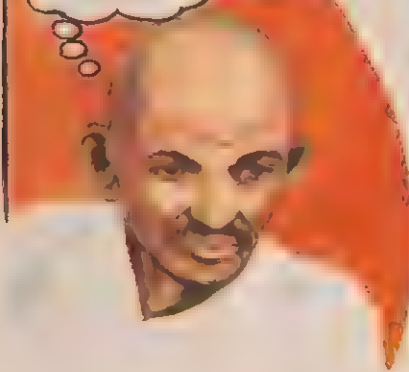
এই বয়কট আন্দোলনের সময় পাঞ্জাবের জননেতা লালা লাজপত রায় পুলিশের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হলেন। ফলে তাঁর মৃত্যু হ'ল।

১৯২৮ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করলেন বার্দোলি তালুকে। জমির খাজনার হার শতকরা ২২ ভাগ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন। সত্যাগ্রহের নেতারূপে নির্বাচিত হলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

অনেক লোক জেলে গেল।
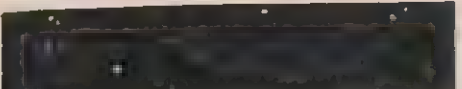
২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০, সারা দেশে "পূর্ণ স্বরাজ" দিবসরূপে প্রতিপালিত হ'ল।

এই সময় তিনি যেন অন্তর থেকে প্রত্যাদেশ পেলেন। লিখলেন বড়লাটকে :

প্রিয় বন্ধু,

আমার মতে বৃটিশ শাসন ভারতের উপরে এক অভিশাপ। ভারতের কোটি কোটি মানুষ এই শাসনের ফলে শোষিত হয়ে আসছে। সুসংগঠিতভাবে অহিংস আন্দোলন ছাড়া আর কোন মতেই বৃটিশ শাসনের এই পরিকল্পিত শোষণ বন্ধ করা যাবে না।

লবণ আইন ভঙ্গ করে আমি আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করতে চাই।

আপনাদের বিশ্বস্ত

স্বাঃ এম. কে গান্ধী
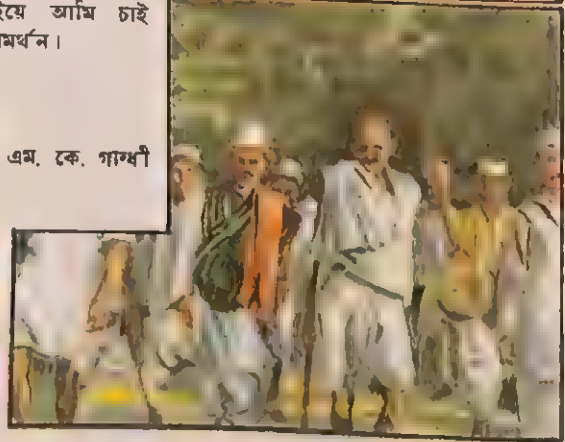
লবণ সরবরাহের ব্যবসা সরকারের একচেটিয়া।

হাজার হাজার লোক গ্রেপ্তার হ'ল
সত্যাগ্রহীদের ভিড়ে জেল ভরে গেল
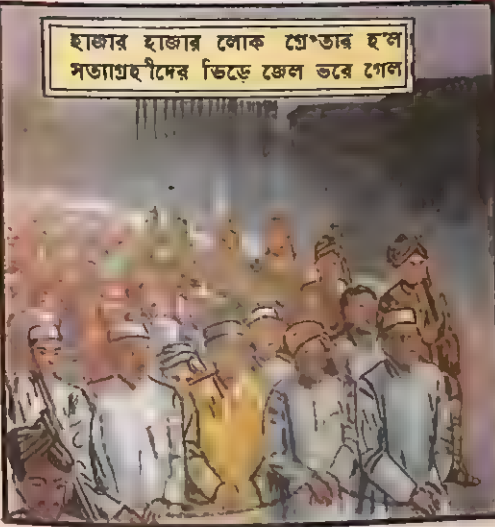
ধৈর্যের বাঁধ এবার ভেঙে গেল। দেশব্যাপী হরতাল সর্বত্র পিকেটিং চলতে লাগল।

বিহারে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের উপর হামলা করল। সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল তাদের উপর দিয়ে।

মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন। ধারসানার লবণ কারখানা লুটে নেবার জন্য সরোজিনী নাইডু ও মণিলাল গান্ধীর নেতৃত্বে জনতা এগিয়ে চলল। সার দিয়ে সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়েছে তাদের বাধা দেবার জন্য।
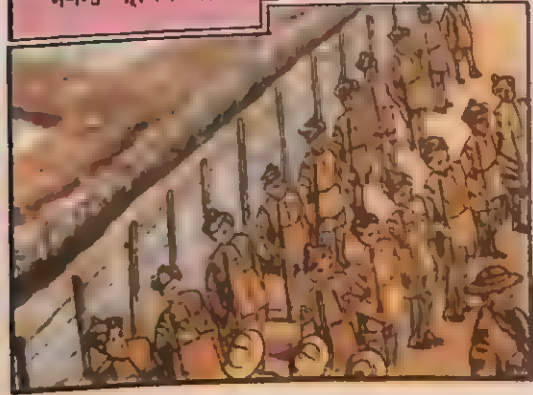
একটি দল এগোল।

এবার এগোল দ্বিতীয় দল। বিনা অস্ত্রের এই সংগ্রামে কেউ পিছু হটবে না।
পুলিশের আঘাতে দুজন প্রাণ দিল, ৩২০ জন আহত হল। গান্ধীজীর আদর্শে এরা নির্ভীক।
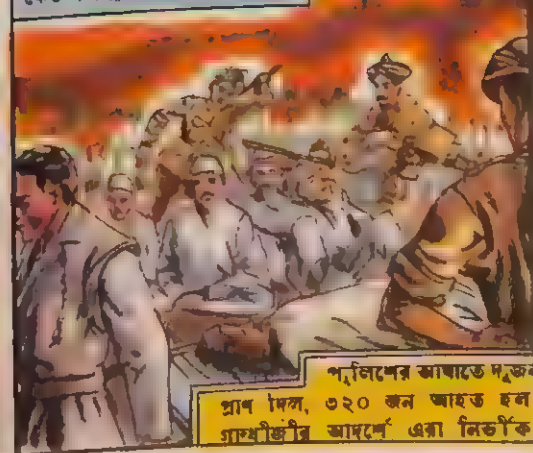
লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠক বসেছে, কিন্তু কংগ্রেস প্রতিনিধি কেউ এই বৈঠকে যোগ দিতে আসে নি। অতঃপর বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন।

বড়লাট গান্ধীজীকে দিল্লী আসবার আমন্ত্রণ করলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি হল। এর শর্ত অনুসারে স্থির হল বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন তুলে নেওয়া হবে।

এককালে যে ছিল ইনার টেম্পল-এর ব্যারিস্টার, আজ সে রাজদ্রোহী ফকির। এই অর্ধনগ্ন লোকটা ইংলন্ডেশ্বরের প্রতিনিধির প্রাসাদে আমন্ত্রিত—এই কথা ভাবতেও আমার গা রী রী করতে থাকে। —চার্চিল

গান্ধীজী গেলেন কংগ্রেসের প্রতিনিধি হয়ে। ইংরেজ জনসাধারণের সদিচ্ছার জন্য তিনি লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন।

সে দেশের জ্ঞানী, গুণী, অধ্যাপক ও লেখকদের সঙ্গে আলোচনা করলেন, বহু স্থানে বক্তৃতা দিলেন।

তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা গান্ধীজীর ভালো লাগলো না।

দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকও বিফল হল।

প্রত্যাবর্তন।

অসহযোগ আন্দোলন আবার শুরু হতে পারে—এই আশঙ্কায় ভারত সরকার গান্ধীজীর অনুপস্থিতিতে সর্বপ্রকার ক্ষমতা গ্রহণ করে তৈরী ছিলেন।
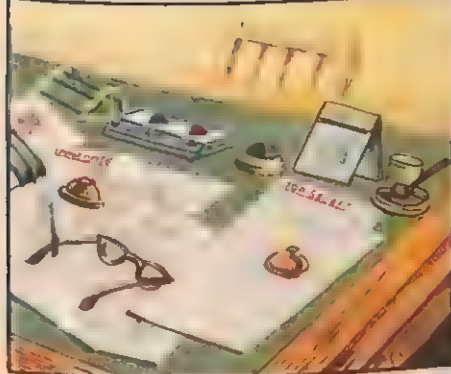
হোম মেম্বার হেগ্‌, অ্যাসেম্বলীতে বললেন
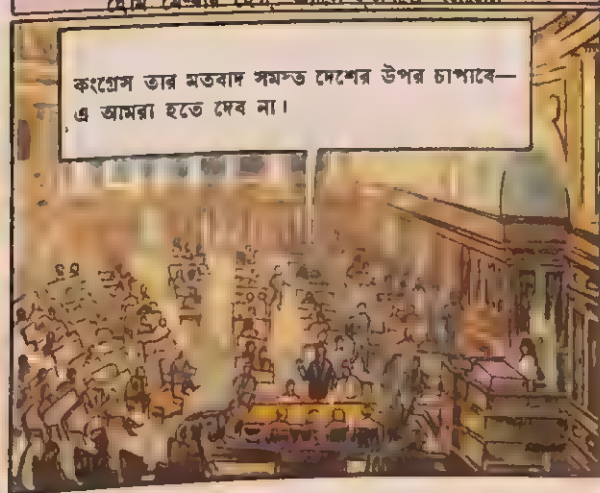
সরকারের সবুর সইল না, গান্ধীজী গ্রেফ্‌তার হলেন, দেশময় ধরপাকড় করে প্রায় আশি হাজার লোককে বন্দী করা হল। গান্ধীজী হরিজনদের পৃথক ভোটাধিকার বিষয়ে সরকারকে লিখলেন :

শুনতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র হিন্দুদের জন্য ও মুসলমানদের জন্যই স্বতন্ত্রভাবে ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, হরিজনদের (অস্পৃশ্যদের) জন্যও পৃথক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হরিজনদের জন্য বিশেষ ধরনের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু হরিজনদের কখনও হিন্দুত্বের পরিমণ্ডল থেকে আলাদা করে দেওয়া যায় না যে পর্যন্ত না তারা নিজেরাই হিন্দু ধর্মের আওতার মধ্যে থাকতে আপত্তি জানায়।

রবীন্দ্রনাথ যা বললেন তার মধ্যে সারা দেশের উদ্বেগ নিহিত ছিল।
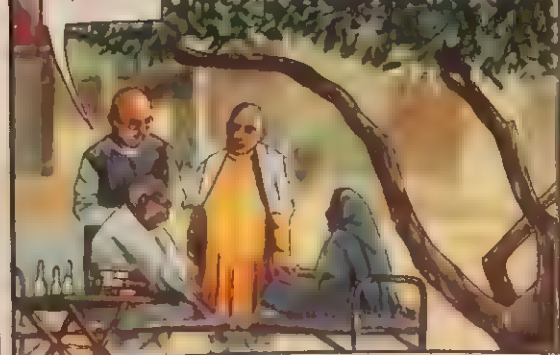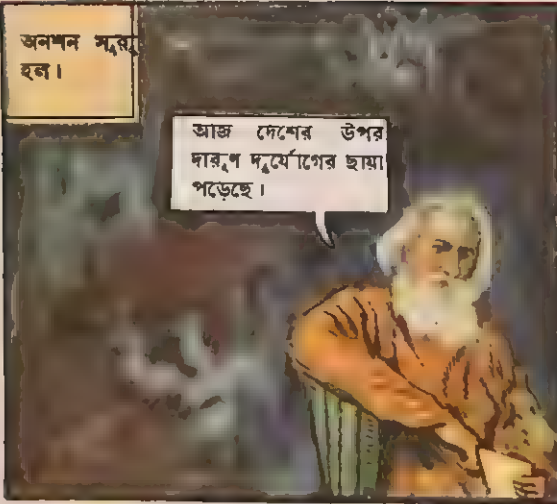
মহাত্মাজীর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে। হরিজন নেতা ডাঃ আম্বেদকরকে ডেকে পাঠানো হল। তিনি বহুক্ষণ অনেক দরকষাকষি করলেন। শেষটায় রাজগোপালাচারির মধ্যস্থতায় একটা আপোষ নিষ্পত্তি হ'ল।

গান্ধীজী জেল থেকে মুক্তি পেলেন। তাঁর অনশন দৈব শক্তির মতো কাজ করলো। বহু শত বৎসরের পর উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা হরিজনদের জন্য মন্দিরের দরজা খুললেন। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুরা একত্র পান ভোজনাদি করলেন।

অস্পৃশ্যতা গান্ধীজীর হাতে চরম দণ্ড পেল।

যেখানেই যান হরিজন সেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

যে সময় মুস্লিম লীগ-এর প্রচার কার্যের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকে, গান্ধীজী তখন রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন। খাদি ও গ্রাম শিল্প উন্নয়নের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছেন।

গান্ধীজীর অনেকদিন থেকে একটি অভিপ্রায়। যমুনালাল বাজাজ ও মহাদেব দেশাইকে ডেকে তিনি মনের কথা বললেন:

আমার মন পড়ে থাকে গ্রামে—ইচ্ছা কোন এক গ্রামে বাস করি।

যদি বলেন সে-গাঁও আপনাকে দিতে পারি।

কিন্তু সেখানে তো রাস্তাঘাট নেই, ডাক-ঘর নেই।
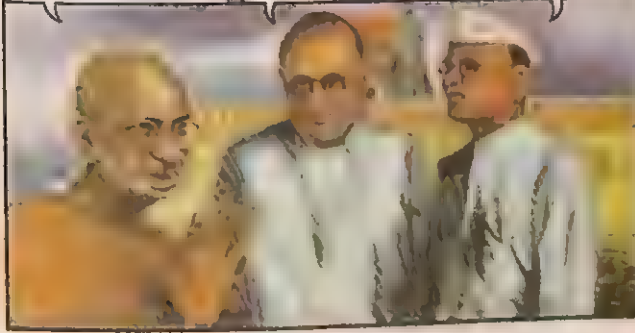
এইভাবে ওয়ার্ধার নিকটবর্তী সেগাঁও গ্রামে গান্ধীজী বসবাস শুরু করলেন। ক্রমে সেখানে গড়ে উঠল সেবাগ্রাম আশ্রম।

সেবাগ্রাম থেকে তিনি নানারকম কাজে নির্দেশ দিতে থাকলেন।

কংগ্রেস দল ভারতের ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন। নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী এই সব গঠনমূলক কাজে সরকারীভাবে সমর্থন জানালেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সেবাগ্রামে একজন নূতন অতিথির সমাগম হল। ইনি পরচুরে শাস্ত্রী কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত।

গান্ধীজী ভাবলেন এইভাবে ঈশ্বর তাঁকে যাচাই করে নিচ্ছেন। তিনি পরচুরে শাস্ত্রীকে আশ্রমে রেখে স্বয়ং তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগলেন।

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের মতো কংগ্রেস শাসিত প্রাদেশিক সরকারকে নির্দেশ দিতেন।

গান্ধীজী কমিটির সদস্য ছিলেন না বটে, কিন্তু কমিটি সর্বদা তাঁর উপদেশ নির্দেশের অপেক্ষা করতেন।

খুদাই খিদমত্‌গার নেতা গফ্‌ফর খান গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্তে। সে দেশ দুর্ধর্ষ পাঠানদের। গান্ধীজীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল
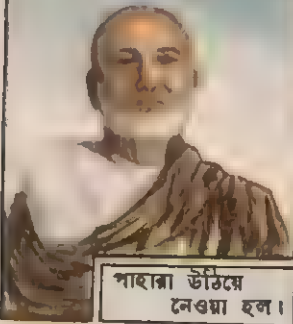
পাহারা উঠিয়ে নেওয়া হল।

গান্ধীজী সারা সীমান্ত প্রদেশ ঘুরে দেখলেন।

এই সময়ে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজা সাধারণ রাজনীতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব কথা দিয়েছিলেন যে শাসন ব্যবস্থার তিনি সংস্কার করবেন। সে কথার তিনি খেলাপ করে আন্দোলনকারী অনেককে গ্রেফতার করে জেলে পুরলেন।
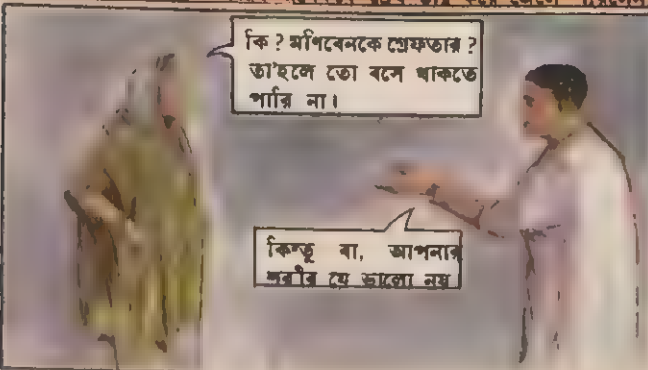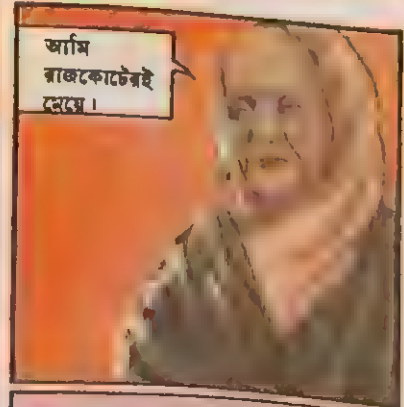
তখন কস্তুরবার বয়স সত্তর বছর। তৎসত্ত্বেও তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিলেন ও কারাবরণ করলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল। ভারতের মতের অপেক্ষা না করে, বৃটেন ভারতকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করল। কংগ্রেস নেতারা পরস্পর আলোচনা করলেন যুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করা উচিত কি না।
ইংরেজ চিরকাল আমাদের পদানত করে রেখেছে। ইংরেজকে কেন সাহায্য করবো?
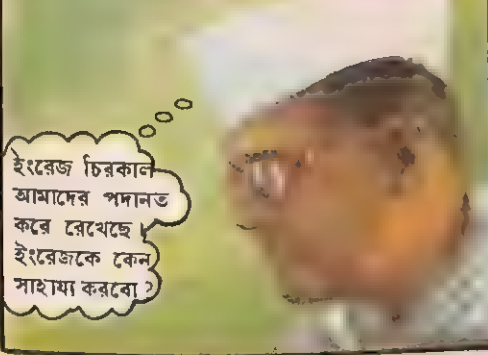
বিপদের সময় ইংরেজকে বিব্রত করা আমার অভিপ্রেত নয়।
ব্রিটেন স্বরাজের প্রতিশ্রুতি না দিলে কংগ্রেস কখনই তাকে সাহায্য করবে না।
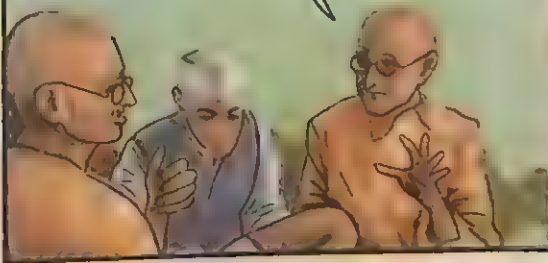
রাজাজীর মতের সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। ভবিষ্যৎই সাক্ষ্য দেবে কার কথা ঠিক, কার কথা ভুল।

আমি জোর করে আমার মত কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাতে চাই না।
কংগ্রেস রাজাজীর মতই গ্রাহ্য করলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের শর্ত মানতে চাইলেন না, ফলে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলেন।

গান্ধীজী চাইলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে অহিংসাপন্থীদের আপত্তি জানাতে। সরকার যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালাতে দেবেন না বলে বাধা দিলেন।
বিনোবা, জহরলাল—এ'রা একে একে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করলেন। বললেন, সরকারের নিষেধাজ্ঞা আমরা মানব না।
সত্যাগ্রহীদের জেলে পোরা হল।
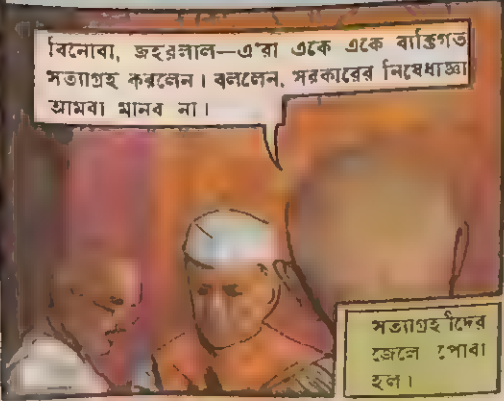
সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দিল। ভারতের কম্যুনিস্ট দল যুদ্ধের সপক্ষে মত দিলেন।
এ যুদ্ধ হল জনগণের যুদ্ধ।

গান্ধীজী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে লিখে পাঠালেন।

১লা জুলাই ১৯৪২

দু দুবার আপনাদের মহাদেশে আমার যাওয়া স্থির হয়েছিল—কিন্তু আমি যেতে পারি নি। আমি জানি ওদেশে অনেকে আছেন যাঁরা আমার বন্ধু। তাঁদের কাউকে আমি চিনি, কাউকে হয়তো চিনিই না।

মিত্র শক্তিরা ঘোষণা করেছেন যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষা করবার জন্য তাঁরা অস্ত্র ধারণ করেছেন। যতদিন ইংরেজ আপনার স্বার্থের খাতিরে ভারতের সম্পদ আত্মসাৎ করতে থাকবে, ততদিন এই ঘোষণা অর্থহীন কথার কথায় পর্যবসিত হয়ে থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

কংগ্রেস ঘোষণা করলেন : 'অবিলম্বে ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হওয়া দরকার।' কংগ্রেস সমস্ত ক্ষমতা গান্ধীজীর হাতে ন্যস্ত করলেন। গান্ধীজী বোম্বাই শহরে অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে উদ্দেশ করে বললেন :

পরদিন ভোরবেলা সরকার গান্ধীজীকে গ্রেফ্‌তার করে পুণার আগা খাঁ প্রাসাদে অন্তরীণ করলেন।
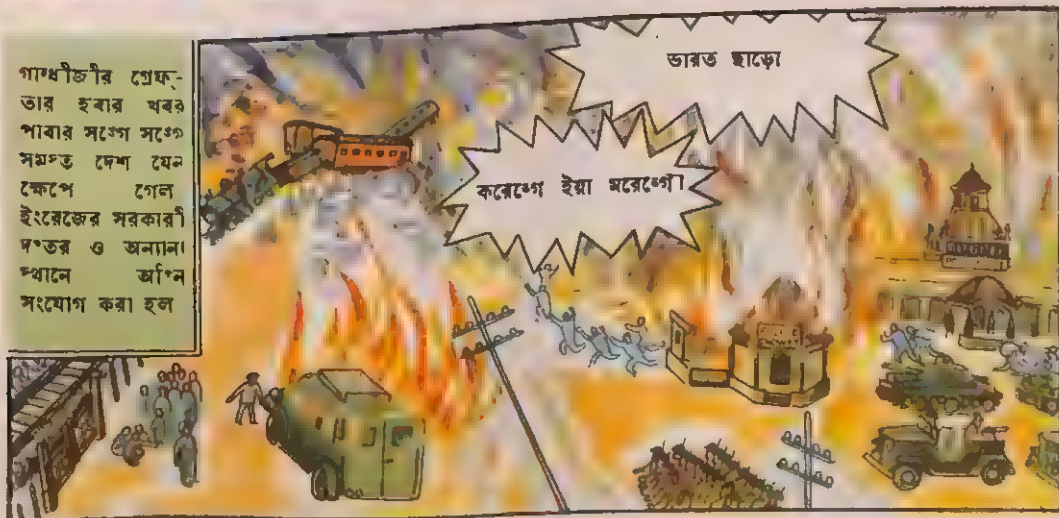
চার্চিল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন।
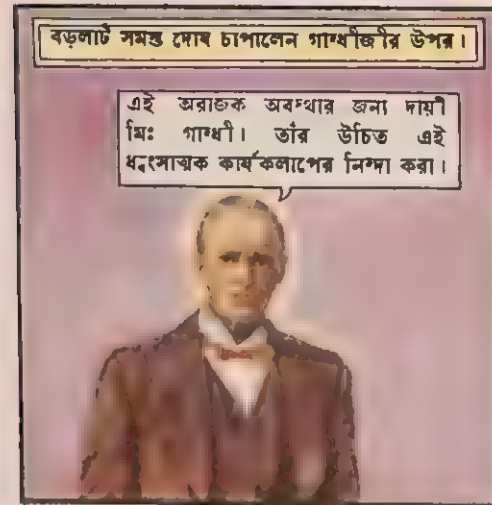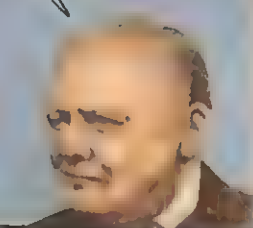
বড়লাট সমস্ত দোষ চাপালেন গান্ধীজীর উপর।
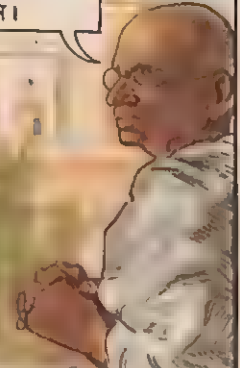
২১ দিন ব্যাপী অনশনে গান্ধীজীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তাঁকে কারামুক্ত করার প্রস্তাব বড়লাট কানে তুললেন না। বহু জনসমাগম হ'ল। সরকার গান্ধীজীর সহকর্মীদের কাউকে কাউকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

কস্তুরবা তুলসীর সামনে স্বামীর জীবন ভিক্ষা করে পূজা দিলেন

বিরাট অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ গান্ধীজী বেঁচে উঠলেন

কিন্তু অনতিকাল পরে কস্তুরবা নিজে গুরুতর অসুখে শয্যাগত হলেন। তখন তাঁর বয়স চুয়াত্তর।

বড় বড় চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। গান্ধীজী নিজে তাঁর সেবা শুশ্রূষার ভার নিলেন।

স্বামীর কোলে মাথা রেখে তিনি চিরনিদ্রায় মগ্ন হলেন।

বা'র মৃত্যুর দেড়মাস পরে গান্ধীজীকে ম্যালেরিয়ায় ধরল। শরীরের তাপ একশো পাঁচ ডিগ্রীতে পৌঁছল। ভারি দুঃসময়।

সারা দেশ গান্ধীজীর কারামুক্তি দাবী করল।

মহাত্মাকে মুক্তি দাও
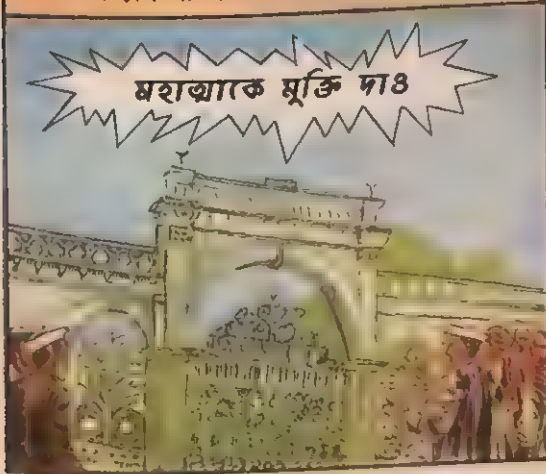
শেষে সরকার তাঁকে মুক্তি দিলেন। এই জেলবাস নিয়ে তাঁর জীবনের ২০৮৯ দিন ভারতের জেলে এবং ২৪৯ দিন দক্ষিণ আফ্রিকার জেলে কাটলো।

মোহম্মদ আলি জিন্না ছিলেন মুসলিম লীগ-এর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা।
আমার লক্ষ্য হিন্দু মুসলিম একতা। কিন্তু একতার আশা আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য। গান্ধী তা চান না।
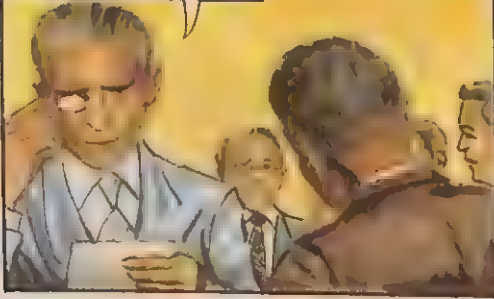
মহাত্মা ও জিন্নার মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়, রাজগোপালাচারীর ব্যবস্থায়।
কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে বোঝাপড়া হলে ইংরেজকে অবিলম্বে এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে। যদি রাজী থাকেন তাহলে মুসলিম লীগ-এর সামনে এই প্রস্তাব পেশ করতে পারি।
এ তো ভারি অদ্ভুত প্রস্তাব—সে কি করে সম্ভব হয়?

ভারতবর্ষ একক দেশ নয়। ভারতের মুসলমানেরা এক সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি, তাদের সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। হিন্দুরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে। আমরা চাই পাকিস্তান।

যে সব প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে ভোট নিয়ে দেখা যাক তারা অন্যান্য প্রদেশ থেকে ভিন্ন হতে চায় কি না?
না তা হয় না
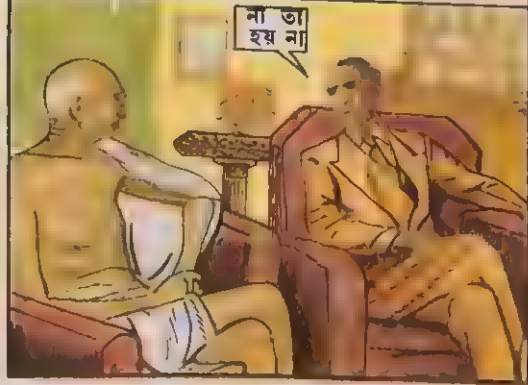
বেশ তো জিন্নাভাই, ইংরেজ ভারত ছেড়ে যাক, তারপর আমরা সব স্থির করব।
না

আলোচনা চলতে থাকে।
আচ্ছা, বেশ তো। একটা ব্যবস্থা হোক্ যাতে কয়েকটা বিষয়ে, যেমন পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অনুরূপ বিষয়ে দুই রাষ্ট্র যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
তা হয় না
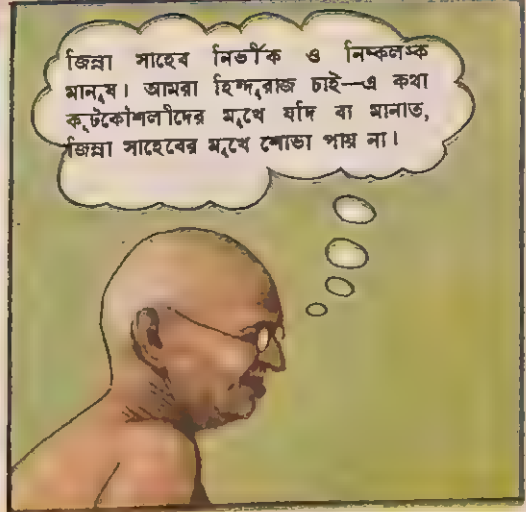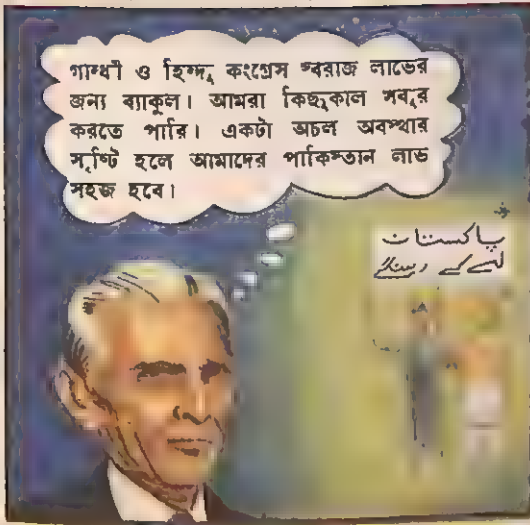
বড়লাট ওয়াভেল দেশের সব নেতৃবৃন্দকে গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলায় আলোচনার জন্য ডেকে পাঠালেন।

বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী এটলী ঘোষণা করলেন :
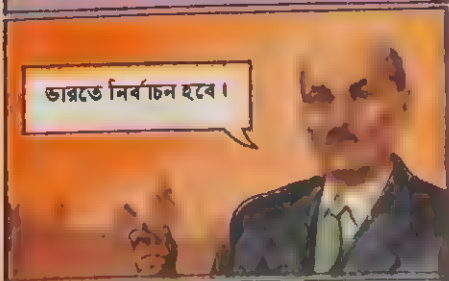
অমুসলমানদের অধিকাংশ আসন এল কংগ্রেসের ভাগে। মুসলিম আসনের অধিকাংশ দখল করল মুসলিম লীগ। অচল অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না।

এটলি বৃটিশ মন্ত্রী সভার তিনজন সদস্যকে দিয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন পাঠালেন কি শর্তে ভারত স্বাধীনতা লাভ করবে—সেই বিষয়ে স্থির করতে। আলোচনা হল, কিন্তু দেখা গেল অনেক মুখ্য বিষয়ে কংগ্রেস ও লীগ একমত হতে পারল না।
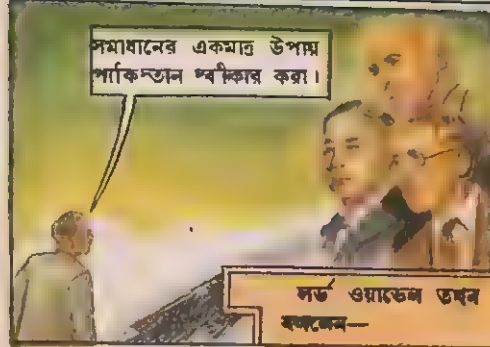
যেহেতু কংগ্রেস ও লীগ একমত হতে পারল না, আমি অস্থায়ীভাবে একটি গবর্নমেন্ট গঠন করব।
নব নির্বাচিত প্রাদেশিক আইন সভা থেকে ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য প্রতিনিধি সদস্যেরা নির্বাচিত হয়ে আসবেন কন্‌স্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে।
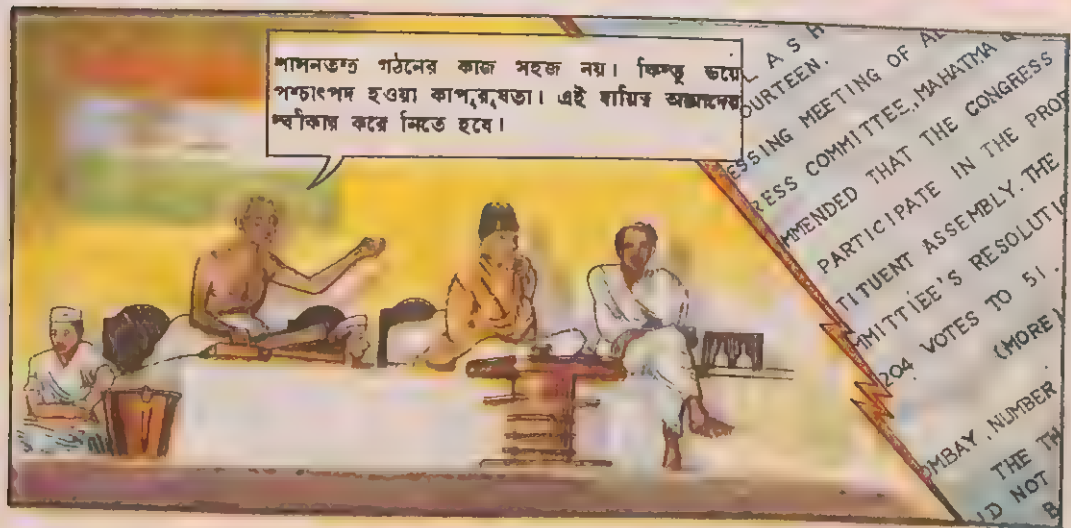
আমরা অস্থায়ী গবর্নমেন্টে যোগ দেব না। ১৬ই আগস্ট আমরা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস রূপে পালন করব।

কলকাতায় তীব্রভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হ'ল। তা'তে হাজার হাজার লোক হতাহত হয়। হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের লোকদেরই যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অন্তবর্তীকালীন গবর্ণমেন্টের নেতা নির্বাচিত হলেন। কিছুদিন বাদে মিঃ জিন্না চারজন মুসলমান এবং একজন তপশীল শ্রেণীর কংগ্রেস-বিরোধী হিন্দু সদস্যকে সেই অস্থায়ী সরকারে যোগদান করার জন্য সুপারিশ করলেন।

এই মন্ত্রীরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে সক্ষম হলেন না, ফলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ আরো ব্যাপকভাবে দেখা দিল।

কলকাতার দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নোয়াখালি ও ত্রিপুরার হিন্দুদের হত্যা করে বা ধর্মান্তর ঘটিয়ে প্রতিহিংসা নেওয়া হল। একই সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে লাগলো বোম্বাইয়ে, পাঞ্জাবে, বিহারে।

এই পরস্পর মারামারি হানাহানি তো গৃহযুদ্ধের সামিল। চারিদিকে আগুন জ্বলছে, এ সময় কি মন স্থির করে বসে থাকা যায়?

মহাত্মা গান্ধী চললেন নোয়াখালি ও ত্রিপুরায়।
এ হল সত্য ও অহিংসার অগ্নি পরীক্ষা। অহিংসার কি শক্তি নেই? সে কি দুর্বলের অস্ত্র? মানুষ দুর্বল হলে হাতিয়ারের জোর কমে
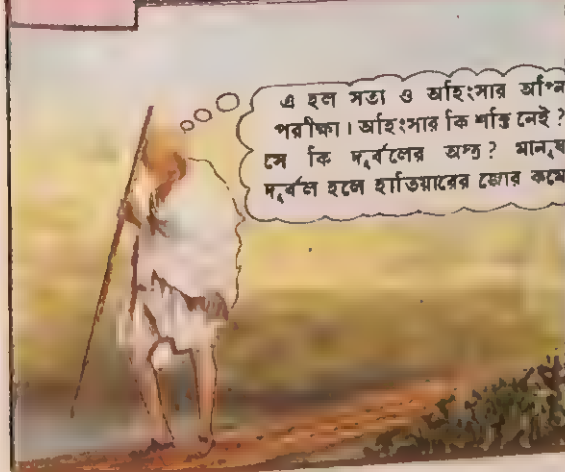
ভগবান! চারিদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আমায় পথ দেখাও—আলো দেখাও।
বিহারের কথা ভাবো গান্ধী
ত্রিপুরা ছাড়ো
পাকিস্তান মেনে নাও
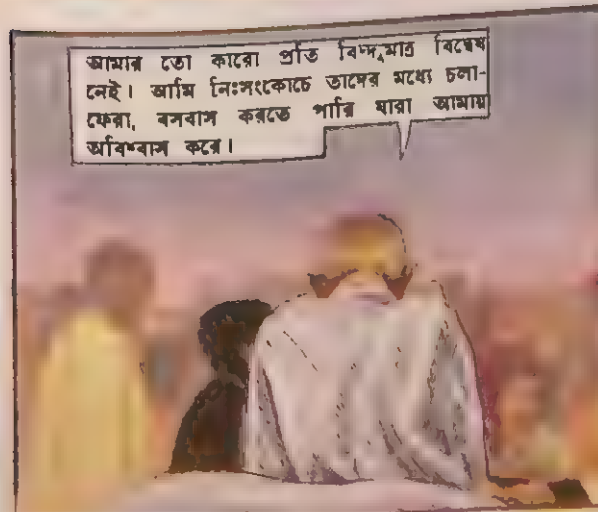
আমার তো কারো প্রতি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষ নেই। আমি নিঃসংকোচে তাদের মধ্যে চলাফেরা, বসবাস করতে পারি যারা আমায় অবিশ্বাস করে।

তাঁর সঙ্গীদের প্রত্যেককে, এমন কি মেয়েদেরও, বললেন, প্রত্যেকে যেন এক-একটা দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে যায়। শিরান্দি গ্রামে শ্রীমতী আমতুস সালাম সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য অনশন শুরু করলেন।
পঁচিশ দিন পর স্থানীয় মুসলমানেরা কথা দিল যে তারা শান্তি রক্ষা করবে। গান্ধীজী বলাতে আমতুস সালাম উপবাস ভঙ্গ করলেন।
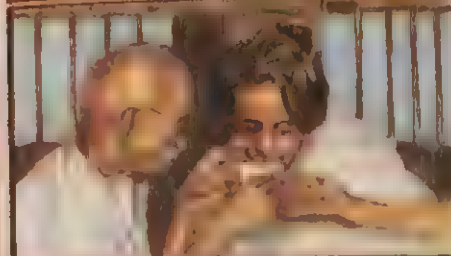
মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এক-এক দিন এক-একটি গ্রাম অতিক্রম করে চললেন, খালি পায়ে।

পাশের গাঁয়ে এক সভায় বক্তৃতা শুরু করলেন। তখন পা ধুয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধতে রাজী হলেন।

অসুস্থ শরীরেও চলার বিরাম ছিল না। তিনি এসেছেন সবার চোখের জল মোছাতে।
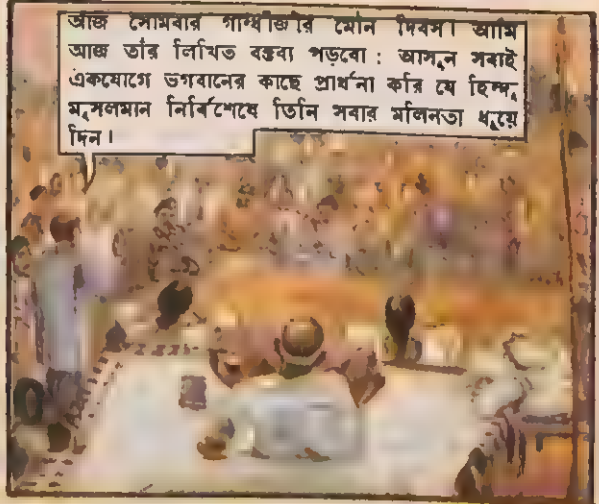
নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অবস্থা অনেকটা শান্ত হল। ততদিনে গান্ধীজী প্রায় ১১৬ মাইল অতিক্রম করেছেন, ৪৯ খানা গ্রাম ঘুরেছেন। এবার গান্ধীজী চললেন বিহারে, সেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের মেরেছে, ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে

মহাত্মা গান্ধী হিন্দুদের ডেকে বললেন :
আপনারা যে মানুষ, সে কথা কি ভুলে গেছেন?
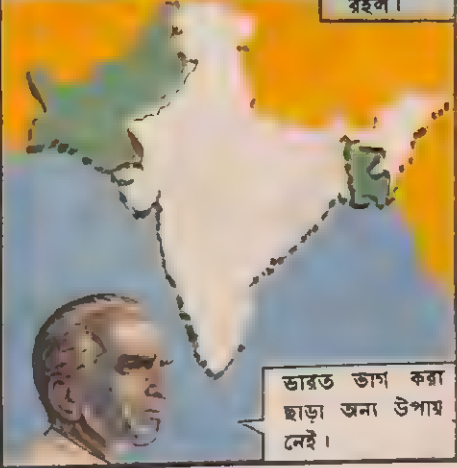
ইতিমধ্যে রাজনীতির ফাঁস তেমনি জটিল হয়েই রইল।
ভারত ভাগ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই।

এই রকম সময়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেন এলেন ভারতের বড়লাট হয়ে। তিনি সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে দেখলেন।
পাকিস্তান রাষ্ট্র পত্তন করা ছাড়া সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ নেই।

পাকিস্তান আমাদের স্বীকার করতে হবে।

অন্যথায় স্বাধীনতার আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে।

যে ভারত এখন রূপ নিচ্ছে তাতে আমার স্থান নেই।

রাজনীতিক স্বাধীনতার চেয়ে সত্য ও অহিংসা আমাদের কাছে ঢের বড়ো।
কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁরা শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগে সম্মতি দিলেন।
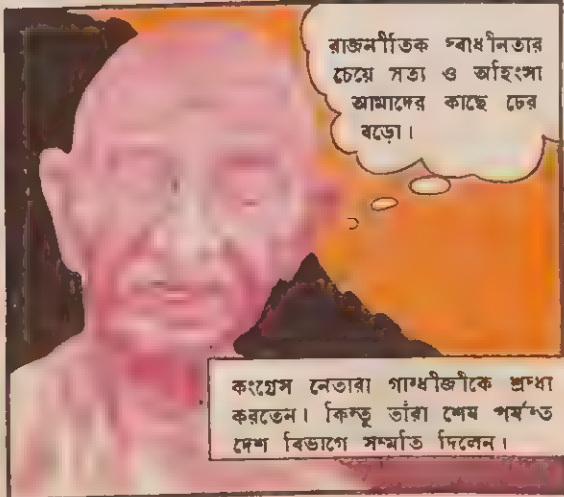
১৯৪৭ অব্দের ১৫ই আগস্ট তারিখে ভারত স্বাধীন হল এবং পাকিস্তানের জন্ম হল।
আনন্দে উৎফুল্ল জনতা জমায়েত হল দিল্লীর লালকেল্লার সামনে।

১৯৪৬ অব্দের ১৬ই আগস্ট তারিখে জিন্না তাঁর 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' ঘোষণা করেন। সেই থেকে কলকাতায় নিত্য রক্তস্নান চলেছে।
এবার থেকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করব হিন্দু-মুসলিম একতার জন্য।
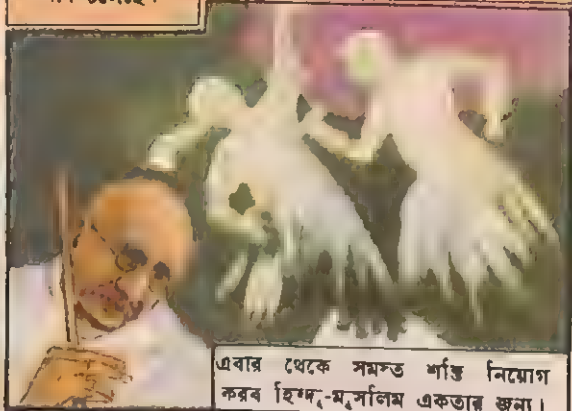
দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গান্ধীজী বাংলাদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির সঙ্গে টহল দিয়ে বেড়ালেন।
মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়
হিন্দু-মুসলিম একতা জিন্দাবাদ
কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা কি সহজে মরতে চায়?

একদিন রাতে উন্মত্ত জনতা এল গান্ধীজীকে মারধোর করতে।

যতদিন না কলকাতায় শুভবুদ্ধি ফিরে আসে, অনাহারে থাকব।
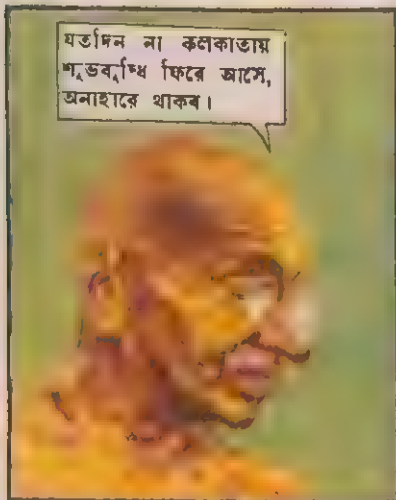
এই অনশনের ফলে সবাইকার মন একটা নাড়া পেল। হিন্দু, মুসলমান ও শিখ নেতারা ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন মহাত্মার কাছে।
মহাত্মাজী, উপবাস ভঙ্গ করুন।
আমরা কথা দিচ্ছি জনতাকে আমরা শান্ত রাখব।
বেশ। কিন্তু আপনাদের কথার যদি খেলাপ হয়, তাহলে আমি আমার চরম অনশন ব্রত গ্রহণ করব।
তারপর আর কোন রকম দাঙ্গা হয়নি।
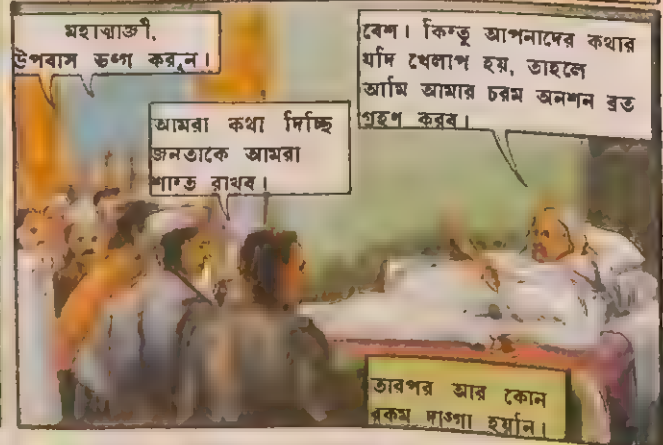
পাঞ্জাবের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন জ্বললো।

আমায় শক্তি দাও, হে ভগবান!
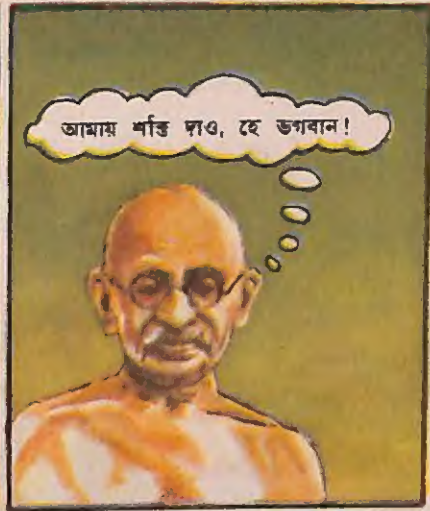
লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কাতারে কাতারে এল ভারতে আশ্রয় লাভের জন্য।
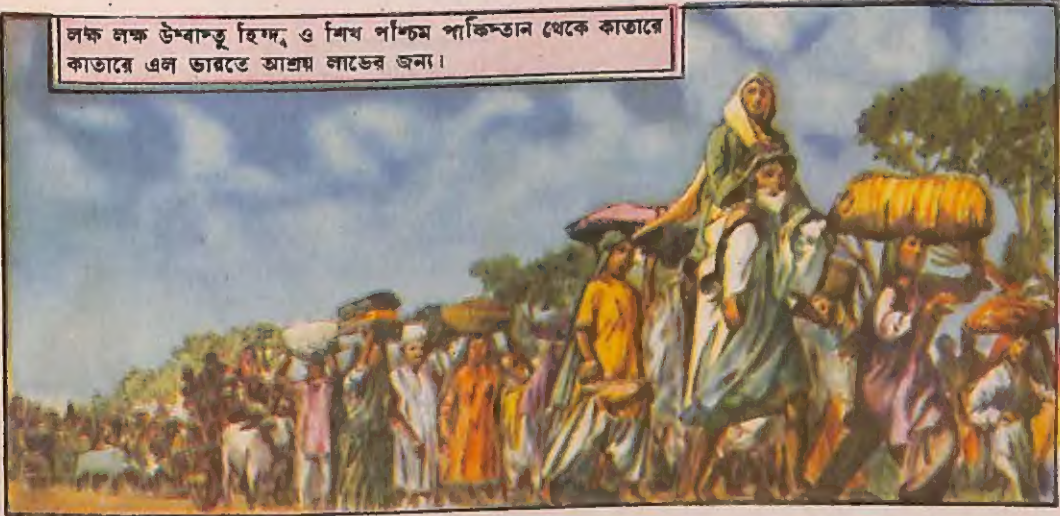
গান্ধীজী রাজধানীতে এলেন। দেখলেন সারা দিল্লীতে সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা। শরণার্থীদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে বেড়ালেন। প্রতি প্রার্থনা সভায় মনের বেদনার কথা বললেন। ক্রমে দিল্লী স্বাভাবিক হল। কিন্তু ঘৃণা ও সন্দেহ সর্বত্র।
অনশন আমার করতেই হবে।

দুর্বল শরীর সত্ত্বেও তিনি একটি বিবৃতি দিলেন।
ভারত বিভাগের আগে তহবিলে যে অর্থ মজুত ছিল, তা থেকে পাকিস্তানের প্রাপ্য হল পঞ্চান্ন কোটি টাকা। ভারত সরকারের উচিত হবে সে টাকা পাকিস্তানকে দিয়ে দেওয়া।
ভারত সরকার সে টাকা দিয়ে দিলেন।

উপবাসের সময় তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন নেতারা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম-গুরুরা।

এ'দের অনুরোধে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করলেন। তাঁর কৃচ্ছ্রসাধন ও দুঃখবরণে পাপের মেঘ যেন কেটে গেল।

গান্ধীজীর কথায় ভারত সরকার পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়েছে, এই খবরে কিছু মাথা গরম চরমপন্থী হিন্দু ক্ষেপে গেল।

বোমা ফেলেছে এক শরণার্থী—তার নাম মদনলাল। মদনলালের বিচার হল।

আর একজন ধর্মান্ধ হিন্দু নাথুরাম গডসে, পুণা থেকে এল দিল্লীতে—উদ্দেশ্য, চরম কান্ড একটা করবে। তারও দৃঢ় বিশ্বাস গান্ধীজী অন্যায়ভাবে মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন।

তিরিশে জানুয়ারী। সেদিন প্রার্থনা সভায় আসতে গান্ধীজীর একটু দেরি হয়েছে।

সারা বিশ্ব গভীর শোকে নিমজ্জিত রাষ্ট্রসংঘের পতাকা নামিয়ে দেওয়া হল।